কুমির চাষ

বছরে আয় করা সম্ভব ১০ কোটি টাকা

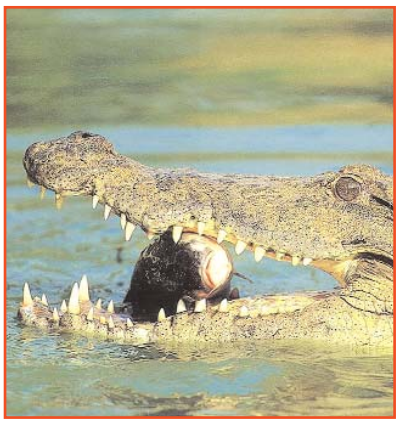

পরিকল্পনার অভাব আর চোরা শিকারিদের জন্য বাংলাদেশের বন্য প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদের খামার গড়ে উঠলে একদিকে যেমনি শিকারিদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করা যাবে অন্যদিকে সৃষ্টি হবে আয়ের নতুন এক উৎস। কুমির নিয়ে ময়মনসিংহের ভালুকায় নেয়া হয়েছে এ ধরনেরই একটি উদ্যোগ...

রিপোর্ট লিখেছেন **আসাদুর রহমান**

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বণ্যপ্রাণীকে নিয়ে গড়ে উঠছে খামার সংস্কৃতি। কুমির, হরিণ, নীলগাই, সাম্বার, গুইসাপ, সাপ প্রভৃতি বণ্যপ্রাণী নিয়ে গড়ে উঠছে বিশাল ফার্ম। এদের মাংস, চামড়া ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে আয় হচ্ছে কোটি ডলার। আমাদের দেশের ফার্মগুলোর এ ধরনের সংস্কৃতি এখনো গড়ে না উঠলেও অনেকেই চিন্তা-ভাবনা করছেন, কাজে হাত দিচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছরের শেষের দিকে গড়ে উঠছে এ দেশে প্রথম কুমিরের খামার।

ভালুকা উপজেলায় প্রায় ১৫ একর জমিতে তৈরি হচ্ছে এই ফার্ম এলাকা। ধারণা করা হচ্ছে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রতি বছর এই খামার থেকে ৫ হাজার বিক্রয়যোগ্য কুমির পাওয়া যাবে। বিশ্ববাজারে এর দাম রয়েছে ৫০ হাজার ডলার।

বাংলাদেশে কুমির ফার্ম গড়ে উঠলেও ফার্মটির মূল টার্গেট বিশ্ববাজার। অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোতে কুমিরের মাংসের চাহিদা রয়েছে। এ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুমিরের চামড়া ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ৩ বছর বয়সী একটি কুমির থেকে মাংস ও চামড়া সংগ্রহ করা যায়। বলা হয়ে থাকে, কুমিরের শরীরের কোনো অংশই ফেলনা নয়। কুমিরের লেজের মাংসটিই সবচেয়ে দামি। ৩ বছর বয়সী একটি কুমিরের লেজ থেকে ৫-৬ কেজি মাংস সংগ্রহ করা যায়। বিশ্ববাজারে এর দাম রয়েছে প্রতি কেজি ১৫ ডলার। তাছাড়া শরীরের অন্য মাংসেরও বাজার মূল্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে মূল্যবান হলো এর চামড়া। কুমিরের শুধু পেটের চামড়াটির বিশ্ববাজার দর ৫০০ ডলার। তাছাড়া পিঠের চামড়াটিও বিক্রি করা যায়। হাত-পায়ের থাবাগুলো দিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন শো-পিস, দাঁত দিয়ে তৈরি হয় দামি গহনা। হাড়গোড়গুলোরও রয়েছে বেশ কিছু ব্যবহার। পারফিউমের মূল উপকরণ হিসেবে কুমিরের হাড় ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া চীনে এই হাড় দিয়ে ওষুধ তৈরি হয়।

ভালুকায় যে কুমিরের খামারটি গড়ে উঠছে তার নাম দেয়া হয়েছে রেপটাইলস্ ফার্ম লিমিটেড। মূলত লোনা পানির কুমির নিয়েই ফার্মটি কাজ শুরু করছে। এ প্রসঙ্গে

ফার্মের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুশতাক আহমেদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'পৃথিবীতে কুমিরের ২৩টি জাত পাওয়া যায়। এর মধ্যে মিষ্টি পানির কুমির, লোনা পানির কুমির ও ঘড়িয়াল পাওয়া যায় এ দেশে। আমরা লোনা পানির কুমির নিয়ে কাজ করবো। কারণ বিশ্ববাজারে লোনা পানির কুমিরের চামড়ার চাহিদা সবচেয়ে বেশি।' তিনি আরো বলেন, 'লোনা পানির কুমির হলেও আমরা যেগুলো দিয়ে কাজ করবো সেগুলোর কয়েক প্রজন্মের জন্ম ও বেড়ে ওঠা মিষ্টি পানিতে। তাই ভালুকার মতো মিষ্টি পানি এলাকায় সহজেই এর চাষ করা যাবে।'

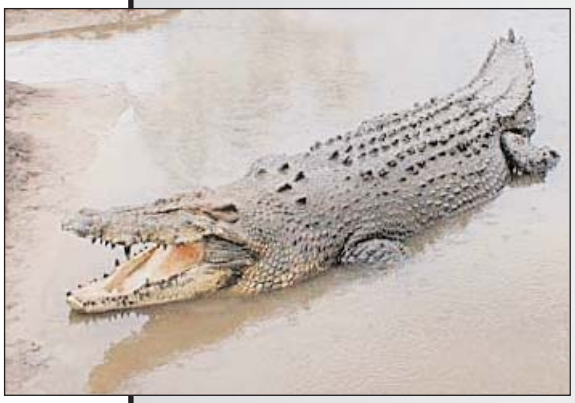

এই কুমিরগুলো সংগ্রহ করা হচ্ছে মালয়েশিয়া থেকে। সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়ায় রয়েছে কুমিরের বেশ কিছু ছোট বড় ফার্ম। থাইল্যান্ডের সামুটপ্রকান ফার্মটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কুমিরের ফার্ম যেখানে ১ লাখ কুমির রয়েছে। শুধু ভিয়েতনামেই রয়েছে ৯০০ কুমিরের খামার। CITES (Convention on International Treaties on Endangered Species.) কনভেনশন অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও পাপুয়া নিউগিনি ছাড়া অন্য কোনো দেশ বন্য কুমির দিয়ে ফার্ম তৈরি করতে পারবে না। কিন্তু ঐ তিন দেশের ফার্মে উৎপাদন হওয়া কুমির নিয়ে অন্য দেশ ফার্ম করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে মুশতাক আহমেদ বলেন, 'আমরা মালয়েশিয়ার যে ফার্ম থেকে আনছি তা একটি CITES রেজিস্টার্ড ফার্ম। এখানে উল্লেখ রয়েছে, এ ফার্মের কুমিরগুলোর পিতামাতার জন্ম অন্য কোন ফার্মের। একে বলা হয় F2 জেনারেশন। আমরা F2 জেনারেশনের পরবর্তী প্রজন্ম নিয়ে কাজ করবো।'

প্রথম বিক্রিতেই উঠে আসবে মূলধন

রেপ্টাইলস্ ফার্ম লিমিটেড ১০ কোটি টাকা পুঁজি নিয়ে কুমিরের ফার্মের কাজে হাত দিয়েছে। বিশ্বব্যাংকের South Asian Enterprise Development Facility (SEDF) কারিগরি সহায়তা হিসেবে ৫০ হাজার ডলার দিচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের Equity and Enterprenionship Firm বাকি টাকার ৪৯% বহন করবে। মুশতাক আহমেদ জানান, '২০০৫ সালে আমাদের কুমির আসবে এবং সে বছরই ডিম দেবে। বাচ্চা ফুটে সেগুলো প্রাপ্তবয়স্ক হতে লাগবে ২০০৮ সাল। ২০০৮ সাল পর্যন্ত আমাদের মোট খরচ হবে প্রায় ১০ কোটি টাকা। ২০০৯ সালে আমরা প্রথম কুমির বিক্রিতে যাবো।'

যে কুমিরগুলো আনা হচ্ছে সেগুলো ডিম দেয় ৪০ থেকে ৫০টি। যদি প্রতি কুমির গড়ে ৪০টি করে ডিম দেয় তবে ৬০টি কুমির থেকে ডিম পাওয়া যাবে ২৪০০টি। এর মধ্যে ৭৫% বাচ্চা যদি বড় করা যায়, তবে ২০০৮ সালে বিক্রয়যোগ্য কুমিরের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৮০০টি। ১০০০ ডলার হিসেবে ১৮০০ কুমিরের দাম দাঁড়াবে ১৮ লাখ ডলার। অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি ৮০ হাজার টাকা।

লোনা পানির কুমিরের চাহিদা সবচেয়ে বেশি জাপান ও আমেরিকায়। বর্তমানে এ দুটি দেশ অস্ট্রেলিয়া থেকে কুমির আমদানি করছে। এ প্রসঙ্গে মুশতাক আহমেদ বলেন, 'অস্ট্রেলিয়াতে ফার্ম থাকলেও সেখানে কুমিরের এখনো চাহিদা রয়ে গেছে। আমরা অস্ট্রেলিয়ার বাজারে ঢুকতে পারবো। তাছাড়া ইউরোপ, আমেরিকায় আমরা সহজেই বাজার ধরতে পারবো। কারণ অস্ট্রেলিয়া থেকে যখন এ ধরনের বিলাস পণ্য ইউরোপে ঢোকে তখন তার ওপর উচ্চহারে লেভি চার্জ ধরা হয়। কিন্তু যখন বাংলাদেশ থেকে যাবে তখন Less development Country হিসেবে আমাদের পণ্যের ওপর লেভি চার্জ ধরা হবে না। এদিক থেকে আমরা কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবো।'

রেপটাইলস্ ফার্মে প্রথম চালানে ১০০টি কুমির আনা হচ্ছে। দাম পড়ছে ২ কোটি টাকা প্রায়। লম্বায় প্রতিটি সাড়ে ৮ ফিটের বেশি। ১০০টির মধ্যে ৬০টি মাদি ও ৪০টি মর্দা। বয়স ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে। ওজন হবে ১০০ থেকে ১৫০ কেজি। মুরগি আর মাছ হবে এদের মূল খাদ্য। এ প্রসঙ্গে ফার্মের সায়েন্টিফিক অফিসার ড. এস এম এ রশীদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা এদের সপ্তাহে দেড় কেজি করে খাবার দেবো।'

যে কুমিরগুলো আনা হচ্ছে সেগুলো এখন প্রতিবছর ১২ থেকে ১৮টি করে ডিম দিচ্ছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুমিরগুলোর ডিমের সংখ্যা ৪০ থেকে ৫০-এ পৌঁছাবে। তবে সঠিক পরিচর্যা করলে অল্প দিনের মধ্যেই ডিমের সংখ্যা বাড়ানো সম্ভব। ডিম ফোটার পর বাচ্চাগুলোর লম্বায় হবে ৩৫ সেন্টিমিটার। ৩ বছর পর যখন কুমিরগুলো থেকে মাংস চামড়া সংগ্রহ করা হবে তখন এগুলোর ওজন হবে ১৫ থেকে ২০ কেজি। লম্বায় হবে প্রায় ৫ ফুট।

কুমিরের ডিম পাড়া, ডিম ফোটা এবং বাচ্চার বেঁচে থাকার বিষয়টিতে বন্য পরিবেশ ও ফার্ম কন্ডিশনে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বন্য পরিবেশে একটি কুমির ১২-১৩ বছর বয়সে ডিম দেয়। কিন্তু ফার্মে সে সঠিক সময় পর্যন্ত খাবার পায় বলে, ৭-৮ বছর বয়সেই ডিম দেয়া শুরু করে।

এ প্রসঙ্গে এস এম এ রশীদ বলেন, 'ফার্ম কন্ডিশনে কুমির বাঁচে বেশিদিন, দীর্ঘ সময় ডিম দেয় এবং ডিমের পরিমাণও হয় বেশি। ডিম ফোটার হারও হয় বেশি। তাছাড়া বন্য পরিবেশে ডিম ফোটার পর মাত্র ১% বাচ্চা বড় হতে পারে। কিন্তু ফার্মে ৯৭% পর্যন্ত কুমিরের বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখার রেকর্ড রয়েছে।' তিনি আরো জানান, 'আমরা প্রথম দিকে ৭৫% বাচ্চা বাঁচিয়ে রাখার টার্গেটে কাজ শুরু করবো।'

১০০টি কুমির রাখার জন্য খামারের ভেতর তৈরি করা হচ্ছে বেশ কিছু পুকুর। প্রায় দুই একর জায়গা নিয়ে এই পুকুর তৈরি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ড. এস এম এ রশীদ বলেন, 'সাধারণত খামারে একটি কুমির যতটুকু লম্বা তার দ্বিগুণ জায়গা দেয়া হয় তাকে থাকার জন্য। আমরা এ নিয়মটিকেই অনুসরণ করবো।'

৩ বছর বয়সী একটি কুমিরের লেজ থেকে ৫-৬ কেজি মাংস সংগ্রহ করা যায়। বিশ্ববাজারে এর দাম রয়েছে প্রতি কেজি ১৫ ডলার। তাছাড়া শরীরের অন্য মাংসেরও বাজার মূল্য রয়েছে। তবে সবচেয়ে মূল্যবান হলো এর চামড়া। কুমিরের শুধু পেটের চামড়াটির বিশ্ববাজার দর ৫০০ ডলার

সাপ, কচ্ছপ, কুমির লিজার্ড প্রাণীজগতে এগুলো সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের মধ্যে কুমিরকে বলা হয় সবচেয়ে বড় সরীসৃপ। কুমির বছরে একবার ডিম দেয়। ডিমের সংখ্যা থাকে ৩০ থেকে ৫০টি। বর্ষাকালের প্রথম দিকে এদের ব্রিডিং কার্যক্রম শুরু হয়। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা ডিম পাড়া শুরু করে। ডিম পাড়ার আগে মা কুমির একটি ঢিবি বানায়। সেখানে সে স্তরে স্তরে ডিমগুলো ঢেকে রাখে। ডিম পাড়ার পর মা কুমিরটি বাসাটিকে নজরে রাখে। কুমিরের ডিম ফুটতে সময় লাগে ৮০ থেকে ৯০ দিন। ডিম ফোটার সময় হলে মা কুমির তা বুঝতে পারে। বাচ্চাগুলো তখন ডিমের ভেতর থেকে শব্দ করতে থাকে, মা কুমিরটি তখন ঢিবির ভেতর থেকে ডিমগুলো উঠিয়ে কিছুটা ভেঙে দেয়। এরপর মা বাচ্চাগুলোকে মুখে করে নিয়ে পানিতে ছেড়ে দেয়।

ডিম পাড়া নির্ভর করে মা কুমিরের বয়সের ওপর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের পরিমাণও বাড়তে থাকে। প্রকৃতিতে ১২-১৩ বছর বয়সে মা কুমির প্রথম ডিম পাড়ে, ৫-৬টি দিয়ে শুরু হয়। ৩৫-৩৬ বছর বয়সে ৪০ থেকে ৫০টিও ডিম পাড়ে। মা কুমিরটির বয়স ৫৫ হবার আগ পর্যন্ত সে এই হারেই ডিম পাড়তে থাকে। প্রকৃতিতে একটি কুমির ৭০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কোনো সরীসৃপ যখন ডিম পাড়ে সেই ডিমে কোনো সেক্স ক্রোমোজোম থাকে না। তাপমাত্রা নির্ধারণ করে দেয় কোন ডিম ফুটে মাদি বা মর্দা বাচ্চা বের হবে। কুমিরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। এ প্রসঙ্গে এস এম এ রশীদ বলেন, 'কুমির ১ মিটারের একটি ঢিবি করলে কিছু ডিম থাকে ঢিবির ওপরের অংশে, কিছু থাকে নিচে। ওপরের অংশে তাপ কম লাগে। তাই ৩১ ডিগ্রি থেকে ৩২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যে কুমিরের ডিম ফোটে সেগুলো হয় মাদি কুমির। ৩৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হয়ে গেলে সেগুলো মর্দা কুমির হয়ে যায়।' ডিম ফোটার পর বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যার মুখোমুখি হয় কুমিরের বাচ্চাগুলো। সেজন্য যে পরিমাণ বাচ্চা বের হয় তার ১ থেকে ২ ভাগ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে।

আমাদের দেশে বণ্যপ্রাণী নিয়ে খামার স্থাপনের কোনো নিয়মনীতি নেই। ফলে এ ধরনের উদ্যোগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। এ দেশের আরো কিছু উদ্যোক্তা বেশ কিছুদিন আগে এ নিয়ে কাজ করেছিলেন। কিন্তু তারা বেশী দূর এগোতে পারেননি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় তারা তাদের পরিকল্পনা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে এ ধরনের উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবে উদ্যোক্তারা সঠিকভাবে সেই কাজ করছে কি না সে বিষয়ে সরকারের কঠোর মনিটরিং ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। কেননা এ দেশে গুই সাপের ফার্ম গড়ে উঠেছিল কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য সুখকর ছিল না।